ঔপনিবেশিক কালে নারী শিক্ষা প্রসারে মিশনারীদের ভূমিকা

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উদাসীনতা ও নিষ্ক্রিয়তা সত্ত্বেও ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্ত্রীশিক্ষার বিষয়টি থামিয়ে রাখা যায়নি ভারতবর্ষে। খ্রিস্টান মিশনারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ও নব্য শিক্ষিত যুবকরা এবং কিছু উদার ও বর্ণবাদী ইংরেজি কর্মচারী স্ত্রী শিক্ষা বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে ভাবনা চিন্তার শুরু করেন। এই প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি হিসেবে বাংলাদেশের নারী জাতির আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়।যার অন্যতম শর্ত হল শিক্ষাকে জীবনচর্চার বাধ্যতামূলক অংশ হিসেবে গ্রহণ করা।

রক্ষণশীল ভারতীয় গোষ্ঠী ভারতবর্ষের স্ত্রীশিক্ষার অনুপস্থিতিকে মানতে অস্বীকার করেছেন এবং প্রমাণস্বরূপ বহু শিক্ষিত মহিলার কথা উল্লেখ করেছেন। ব্রিটিশ কর্মচারী উইলিয়াম অ্যাডামসের বিবৃতিতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে শিক্ষিত মহিলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যারা দেশকাল সামাজিক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। সেখানে একাধারে জমিদার তথা শিক্ষিত মহিলারা, অন্যদিকে বৈষ্ণব ধর্মের মহিলাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যারা ধর্মীয় শিক্ষার জন্য স্ত্রী শিক্ষায় অগ্রসর হন।বেশকিছু জমিদার মহিলা রাণীর কথা তার বিবরণ এ আছে যেরকম নাটোরের রানী ভবানী, রানী সূর্যমনি এরা সবাই স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন।

কিন্তু এই সবই ছিল ব্যতিক্রমী ঘটনা। সমাজের মূল স্রোতে উনবিংশ শতকে নারীর ভূমিকা গৃহশ্রমে এরমধ্যেই বদ্ধ রাখা হয়েছিল।এখানে এমন এক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয় যেখানে অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে থাকে শুধু পুরুষদের অধিকার ও গতিবিধি। নারীর অধিকার তার পরিবারের মধ্যেই সীমিত হয়ে পড়েছিল।

এই ধরনের সামাজিক প্রেক্ষাপটে খ্রিস্টান মিশনারীরা ভারতবর্ষের নারী শিক্ষা বিস্তারে অগ্রসর হন। খ্রিস্টান সংঘের মহিলারা ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোনরকম সরকারি সাহায্যের অপেক্ষা না রেখেই কলকাতা এবং শহরের বিভিন্ন স্থানে

বিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষা বিস্তারের কাজ শুরু করেছিলেন। সংঘবদ্ধভাবে কাজ শুরু হয় কলকাতা ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসাইটির নেতৃত্বে ১৮১৯ সালে।তাদের প্রচেষ্টায় কলকাতা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি তৈরি হয় এবং স্ত্রী শিক্ষার পর্যায়ে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ হয়। ১৮২৪ সালে ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি বেঙ্গল ক্রিশ্চিয়ান স্কুল সোসাইটি সঙ্গে একত্রিত হয়ে যায়।মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ছিল এই শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এছাড়াও স্ত্রী শিক্ষা প্রচারে মিস কুক ও দি ব্রিটিশ এন্ড ফরেন স্কুল সোসাইটির কথা উল্লেখ করা দরকার।উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সামাজিক রক্ষণশীলতা কে ছিন্ন করে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ২০০ মহিলাকে এরা শিক্ষার ছত্রছায়ায় নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। ১৮২৪ সাল নাগাদ বিভিন্ন খ্রিস্টান মিশনারী সংস্থার উদ্যোগে কলকাতা চুঁচুড়া বর্ধমান ঢাকা-চট্টগ্রাম ইত্যাদি স্থানে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।*সমাচার দর্পণ* এর হিসাব মতো শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা ৭১ এবং শিক্ষার্থী সংখ্যা ১২৭০ ছিল।সুতরাং বিদ্যায়তন পাঠক্রম ও পরীক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার মূল্যায়ন রীতি প্রবর্তন করে স্ত্রীশিক্ষা ধারাকে খ্রিস্টান মিশনারীরা কিছুটা হলেও পরিবর্তন করতে পেরেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু বর্তমানে গবেষকরা প্রশ্ন তুলেছেন যে কেন খ্রিস্টান মিশনারীরা এই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, যেখানে স্বয়ং নারী সমাজে সংকুচিত হয়েছিল।হিবেরনিয়ান অক্সিলারি সোসাইটির রিপোর্টে এর উত্তর কিছুটা হলেও পাওয়া যাবে।এই রিপোর্টে বলা হয় যে স্ত্রীশিক্ষা কলকাতায় থেমে থাকতে পারেনা। সমগ্র মহাদেশের নিশ্চয়ই ব্যপ্তি ঘটবে। সমগ্র দেশে জ্ঞানের আলো সংবাদ প্রচার কেন্দ্র হবে কলকাতা। হিন্দু মহিলারা সমাজে প্রভাব বিস্তার করে সামাজিক পরিবর্তন করতে সক্ষম হবেন.। পুরুষের নির্দেশ মত মেয়েরা নিজেদের সন্তান বিসর্জন দিতে রাজি হবেন না অথবা আত্মবিসর্জন দেবেন না বরং সে কুসংস্কার দূর করতে সচেষ্ট হবে। সুতরাং এই ভাবনা থেকেই মিশনারীরা ভারতবর্ষে নারী শিক্ষা প্রসারে অগ্রসর হয়েছিল।

খ্রিস্টান মিশনারীরা নব্য শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত **মহিলাদের পাঠক্রম** এর ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কিছু নিতে নিয়েছিলেন। মিসেস উইলসনের বিদ্যালয় ১৮২৯ সালের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল ব্রিটিশ সাহিত্য। মোক্ষ লাভের উপায় সম্পর্কে যীশুর উপদেশ নিয়ে মাতা কন্যার কথোপকথন, বাংলার অনূদিত বাইবেলের ইতিহাস, সেন্ট মেথ্যুর গসপেল, এবং খ্রীষ্টের দ্বাদশ শিষ্যের প্রচার কাজের বিবরণ। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে পাঠক্রমকে আরেকটু বর্ধিত হয়। সেখানে যুক্ত হয় জোসেফের ইতিহাস প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, বাইবেলের ইতিহাস, ভূগোল্এলার্ট অন এর কথোপকথন, নিউ টেস্টামেন্ট প্রভৃতি। এছাড়া স্তোত্র মুখস্ত ও সেলাইয়ের কাজ ছিল তাদের পাঠক্রমের অন্যতম অঙ্গ।এই পাঠক্রমে মোটামুটিভাবে সমস্ত খ্রিস্টান মিশনারি বিদ্যালয়গুলো অনুসরণ করতো।কোথাও কোথাও বাংলা বানান ও কয়েকজন নির্বাচিত ছাত্রীকে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া হত।বালিকাদের পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কহীন এ পাঠক্রমের উদ্দেশ্য ছিল খুব পরিষ্কার-খ্রিস্টান মিশনারীরা চাইতো শিক্ষার্থীদের খ্রীষ্টের শিক্ষা ও ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করতে।দেখা গেছে চার্জ মিশনারি সোসাইটি প্রতিবেদনে অনেক শিক্ষার্থী খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছে তার বাবা-মা সমেত।

শিক্ষার সমস্ত আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করা সত্বেও মিশনারীরা ছাত্রীদের ধারাবাহিকভাবে শিক্ষা দিতে পারতেন না কারণ অধিকাংশ ছাত্রীদের অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যেত।বাস্তব জীবনের সঙ্গে নিযুক্ত শিক্ষাকে বিস্মরণ হতে তাদের বেশি সময় লাগত না। ফলে বিদ্যাচর্চার জন্য যে অর্থ সময় বিনিয়োগ করা হয়েছে তা পুরোই অপচয় হত।

পরিশেষে বলা যায় উনবিংশ শতকে খ্রিস্টান মিশনারী শিক্ষাব্যবস্থা তেও সাধারণ জ্ঞান অর্জনের মাত্রার বাইরে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মত মুক্ত বিদ্যালয় জ্ঞানার্জন নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় বলে তারা মনে করেন নি, ফলে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রটি সীমাবদ্ধ থেকে যায়।